OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 49*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 383 - 393*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 383 - 393*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848*

# সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা কাহিনিতে সিধুজ্যাঠা চরিত্রটির উপস্থিতি : একটি মূল্যায়ন

রাহুল দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কটন বিশ্ববিদ্যালায়
Email ID : rahuldey.gu@gmail.com

***Received Date*** *21. 09. 2024*
***Selection Date*** *17. 10. 2024*

***Keyword***
*Feluda, Topse, Satyajit roy, literature, Satyajit's character.*

***Abstract***
*Satyajit's literary work is covered by Feluda stories. Satyajit started writing Feluda's stories keeping in mind the juvenile literature lovers, but later it was found that Feluda's readers are not only teenagers, but also adult readers find elements of joy in them. In the thirty-five stories of Feluda series, we meet various characters, but among them, except Feluda, the main characters are, Feluda's assistant cousin brother Topse, Lalmohan Ganguly Mashai and Sidhu Jatha (of Feluda and Topse). We will look at how much the character needs in the story. And at the same time, we will see how deep Feluda's relationship with this inanimate soul is. This person is like a portable encyclopaedia. This old man's extraordinary memory, huge library and generous heart had helped in various ways in the investigations of Feluda. Singleness, apparent anti-social this person only addiction is to reading books, his married life with books. The only purpose of his life is to pursue knowledge. We see all these visions in Satyajit's character; therefore, we have tried to show that Sidhujatha is Satyajit's self-projection to some extent in our overall discussion.*

## Discussion

সিধুজ্যাঠার আসল নাম সিদ্ধেশ্বর বোস। তিনি থাকেন সর্দার শঙ্কর রোডে, কোলকাতার কালিঘাটের লেক মার্কেটের কাছে। তিনি কখনো সখনো হেঁটেই ফেলুদার বাড়িতে চলে আসেন, সময় লাগে পাঁচ মিনিট। আশ্চর্য রকমের মেধা, স্মৃতিশক্তি এবং জ্ঞান ছিল তাঁর। সাম্প্রতিক এবং ঐতিহাসিক-দুই দিকেই ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞানের প্রসার। তিনি ফেলুদার কাছে ছিলেন ‘বিপদ-ভঞ্জন ত্রাতা মধুসুদন’-এর মতো। যখন যখন ফেলুদার কোনো তথ্য এবং সাহায্য দরকার হয়ে পড়তো, তখন তখন সে সিধুজ্যাঠার কাছে যেত।

রক্তসম্পর্কহীন অনাত্মীয় কেমন করে স্বজন হয়ে ওঠে, সেই অভিজ্ঞতা বাল্যেই অর্জন করেছিলেন সত্যজিৎ। ‘যখন ছোট ছিলাম’-এ সে কথা লিখেওছেন তিনি —

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 49*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 383 - 393*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

> "মামার খেলার সাথীদের মধ্যে ছিলেন আরেক মামা, যিনি আমাদের বাড়িতেই থাকতেন একতলার পুবদিকের ঘরে। আসলে ইনি আত্মীয় নন। ঢাকায় মামাবাড়ির পাশেই ছিল এঁদের বাড়ি। সেই সূত্রে বন্ধু, আর তাই আমি বলি মামা। কালুমামা।"[১]

অনাত্মীয় মানুষের আত্মীয় হয়ে-ওঠার এই ছাঁচটি সত্যজিতের মনে শৈশবেই গেঁথে গিয়েছিল, যার ফল ফলবে তাঁর গল্পমালায়। 'ডুমনিগড়ের মানুষখেকো' গল্পে (আনন্দমেলা, পৌষ ১৩৮৮) ছোট্ট কথক, তারিণীখুড়ো সম্পর্কে জানায়-

> "আমার জন্মের আগে বাবারা যখন ঢাকায় ছিলেন, তখন তারিণীখুড়ো ছিলেন আমাদের পড়শী। তাই খুড়ো। বাবারও খুড়ো, আমাদেরও খুড়ো।"[২]

ঠিক একই পরিচয় নিয়ে ফেলুদার গল্পমালায় আবির্ভূত হবেন সিধু জ্যাঠা। 'বাক্স-রহস্য'-এ তোপসে লেখেন —

> "বাবা যখন দেশের বাড়িতে থাকতেন- আমার জন্মের আগে-তখন পাশের বাড়িতে এই সিধু জ্যাঠা থাকতেন। তাই উনি বাবার দাদা আর আমার জ্যাঠা।"[৩]

'সোনার কেল্লা'-তেও তোপসে জানায়—

> "আসলে সম্পর্কে আমাদের কিছুই হন না উনি। আমাদের যে পৈতৃক গ্রাম (আমি যাইনি কক্ষনো) উনি সে গ্রামেরই লোক, আর আমাদের বাড়ির পাশেই ওঁর বাড়ি ছিল। উনি তাই আমার বাবার দাদা আর আমার জ্যাঠামশাই।"[৪]

কে এই সিধু জ্যাঠা? অপর্ণা সেনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে (সানন্দা, ৩১.৭.১৯৮৬) সত্যজিৎ বলেন-

> "I am very interested in a loner, আমার অনেক গল্পেতেই দেখবি তুই-একটিমাত্র লোক, সে বিয়ে করেনি, তার ছেলেপিলে নেই, একা থাকে। ...আমার গল্প লিখতে গেলেই ওই একা লোকেদের নিয়ে লিখতে ইচ্ছে করে। ...বোধ হয়... আমি নিজে ত... আমার অনেকটা জীবনই ভীষণ একা একা ভাবে কেটেছে, কেননা আমার ভাইবোন ছিল না। ছেলেবেলায় তো ভীষণই একলা ছিলাম। আমার বাড়ির চাকরের ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল...।"[৫]

নিজের একলা-থাকার মুদ্রাদোষ দিয়েই সত্যজিৎ গড়ে তুলেছেন প্রদোষচন্দ্র মিত্র, লালমোহন গাঙ্গুলি এমনকি সিদ্ধেশ্বর বোসকেও। 'হত্যাপুরী'-তে ফেলুদা বলে -

> "আমার এক জ্যাঠামশাই আছেন, নাম সিদ্ধেশ্বর বোস।"[৬]

'বাক্স-রহস্য' থেকে জানা যায় সিধু জ্যাঠা 'টোয়েন্টিওয়ানে' - 'বি-এ পরীক্ষা' দিয়েছিলেন। তার মানে সিধু জ্যাঠার জন্ম সাল আনুমানিক ১৯০০-১৯০১। অবশ্য এখানে একটা ছোট্ট গণ্ডগোল আছে। 'নেপোলিয়নের চিঠি', যে কেসের সময়কাল ১৯৮০, তাতে জানা যাচ্ছে যে ফেলুদারা সিধু জ্যাঠার 'সত্তর বছরের' জন্মদিন উপলক্ষে একটা দাবার সেট কিনতে বেরিয়েছে। ১৯৮০ সালে সিধু জ্যাঠার সত্তর বছর বয়স হলে, তাঁর জন্মসাল দাঁড়ায় ১৯১০। সেক্ষেত্রে ১৯২১ সালে জ্যাঠার পক্ষে বি এ পরীক্ষা দেওয়া অসম্ভব। সিধু জ্যাঠার জীবনের আরও কিছু তথ্য জানা যায় 'সোনার কেল্লা' থেকে –

> "সিধু জ্যাঠা জীবনে নানারকম ব্যবসা করে অনেক টাকা রোজগারও করেছেন, আবার অনেক টাকা খুইয়েওছেন। আজকাল আর কাজকর্ম করেন না। বইয়ের ভীষণ শখ, তাই গুচ্ছের বই কেনেন, কিছুটা সময় সেগুলো পড়েন, বাকি সময়টা একা একা বই দেখে দাবা খেলেন...।"[৭]

দাবা খেলতে ভালোবাসেন বলেই 'নেপোলিয়নের চিঠি'-তে দেখি- 'সিধু জ্যাঠার সত্তর বছরের জন্মদিনে তাঁকে একটা ভালো দাবার সেট উপহার দিতে চায় ফেলুদা।' আর 'বাক্স-রহস্য'-এ নরেশ পাকড়াশীকে ফেলুদা বলেছিল—

> "আপনি বাড়িতে বসে একা একা দাবা খেলেন, আপনার মাথা পরিষ্কার, আপনার স্মরণশক্তি ভাল।"[৮]

ফেলুদা-কাহিনি যখন লেখা শুরু হয় (১৯৬৫), তখন তো নয়ই, এমনকী সত্যজিৎ রায়-এর মৃত্যু পর্যন্তও ইন্টারনেট বা গুগ্‌ল-এর চর্চা ছিল না। কিন্তু ফেলুদার 'গুগল্ল' ছিলেন সিধুজ্যাঠা- একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সিধুজ্যাঠা খবরের কাগজ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সব খবরের কাটিং কেটে রাখতেন, একটি খাতায় আঠা দিয়ে লাগিয়ে তা সংরক্ষিত করতেন। সেই সব খবর ভর্তি খাতা তিনি ফেলুদাকে পড়তে দিতেন তদন্তের প্রয়োজনে। সিধুজ্যাঠার আসল দাম্পত্য ছিল বইয়ের সঙ্গে। তাঁর একজন তক্তপোষ, দুটো চেয়ার, ইয়া বড়ো বড়ো তিনটে বইয়ের আলমারি। তক্তপোষটাও অর্ধেক বইয়ে বোঝাই ছিল। বাকি খালি জায়গাটায় তিনি বসতেন। সিধুজ্যাঠা ছিলেন ইতিহাসমুখী। গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে যে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের ইতিহাসটা ভালো করে পড়ে নিতে হবে, এই বিশ্বাস ছিল তাঁর।

ইংরেজি শব্দকে বেঁকিয়ে বাংলা করে নেওয়ার বাতিক ছিল সিধুজ্যাঠার। যেমন— 'প্যারাসাইকোলজি' হল 'প্যারা ছাই চলো যাই', 'এক্সিবিশন' হল 'ইস্ কী ভীষণ', 'ইমপসিবল' হল 'আম পচে বেল', 'ডিকশনারি' - 'দ্যাখস নাড়ী', 'গভর্নর' 'গোকর নাজু' প্রভৃতি। এমন মজাদার পথপ্রদর্শককে যে গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্তির ওরফে ফেলুদা যে একটু আলাদা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, একথা বলাই বাহুল্য। সিধুজ্যাঠার উল্লেখ ফেলুদার সব গল্প-উপন্যাসে নেই। মোট পঁয়ত্রিশটি কাহিনির মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে সিধুজ্যাঠার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি আছে-সোনার কেল্লা (১৯৭১), বাক্স-রহস্য (১৯৭২), কৈলাসে কেলেঙ্কারি (১৯৭৩), গোরস্থানে সাবধান (১৯৭৭), গোলকধাম রহস্য (১৯৮০)। এছাড়া হত্যাপুরী (১৯৭৯) এবং টিনটোরেটোর যীশু (১৯৮২) উপন্যাসে সিধুজ্যাঠার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটিতেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে বা জরুরি-দুষ্প্রাপ্য বই পড়তে দিয়ে তিনি ফেলুদাকে রহস্য সমাধানে সাহায্য করেছেন। সোনার কেল্লা উপন্যাসে ফেলুদা যে জিওমেট্রির বইটা পড়ছিল, সেটা ছিল সিধুজ্যাঠার। জ্যাঠা আবার সবাইকে বই ধার দিতেন না। বইয়ের প্রতি খুব যত্ন ছিল তাঁর। তাই ফেলুদা বইটা এনে প্রথমেই তাতে একটা মলাট দিয়ে নিয়েছিল।

সিধুজ্যাঠাকে আমরা প্রথম পাই 'সোনার কেল্লা' উপন্যাসে। এখানে সুধীর ধর নামের এক ভদ্রলোক এসেছিলেন ফেলুদার কাছে। তাঁর ছেলে মুকুল নাকি জাতিস্মর, সে 'সোনার কেল্লা'র গল্প করে। তাকে নিয়ে এক প্যারাসাইকোলজিস্ট ড. হাজরা রওনা হন রাজস্থানে। ছেলেটি গুপ্তধনের কথা বলে, ফলে রহস্য জমে ওঠে। মুকুলের পিছনে পড়ে যায় দু'জন দুর্বৃত্ত। তাকে উদ্ধারের জন্য ফেলুদা আর তোপ্সে পাড়ি দেবে রাজস্থানে। তার আগে খুব জরুরি প্রয়োজনে ফেলুদা যায় সিধুজ্যাঠার কাছে। এখানেই ফেলুদা-সিরিজে সিধুজ্যাঠার প্রথম আবির্ভাব। সকালে তুফান এক্সপ্রেসে ওঠার আগে ফেলুদা গিয়েছিল সিধুজ্যাঠার বাড়িতে। উদ্দেশ্য ছিল ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্ধান। সিধুজ্যাঠাও এই বিশেষ মানুষটির সম্পর্কে অবগত ছিলেন কারণ খবরের কাগজে তাঁর কথা তিনি পড়েছিলেন এবং তাঁর উপর যথেষ্ট শ্রোদ্ধা ছিল। শিকাগো শহরে দুই বুজরুকিকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন ডক্টর হাজরা। শিকাগো শহরে হিপনোটিজমের নাম করে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল অমিয়নাথ বর্মন, ভবানন্দের ছদ্মবেশ ধারণ করে। এই তথ্য এবং 'প্যারাসাইকোলজিক্যাল সোসাইটি'র তিনখানা জার্নাল ধার নিয়ে ফেলুদা তদন্ত শুরু করে। তদন্তের শেষ হয় আসল ড. হাজরার পরিচয় উদ্ঘাটন এবং ভবানন্দ ওরফে নকল ড. হাজরা ওরফে অমিয়নাথ বর্মন, ওরফে দ্য গ্রেট বারম্যান-উইজার্ড অফ দ্য ইস্টের ধরা পড়ার মধ্য দিয়ে। সিধুজ্যাঠার দেওয়া তথ্যের জন্য যে ফেলুদার তদন্ত করতে অনেক সুবিধা হয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

'বাক্স-রহস্য' উপন্যাসে ফেলুদার মক্কেলের নাম ছিল দীননাথ লাহিড়ী। তাঁর একটি অ্যাটাচি কেস কালকা মেলে এক সহযাত্রীর সঙ্গে বদলে গিয়েছিল। বাক্সে নাকি তেমন মূল্যবান কিছুই ছিল না। শুধু ছিল একটি ভ্রমণকাহিনি, লেখকের নাম শম্ভুচরণ বোস। লেখাটি ১৯১৭ সালের এবং দীননাথ লাহিড়ীর জ্যাঠামশাই সতীনাথ লাহিড়ীকে উৎসর্গ করা। দীননাথ

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 49*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 383 - 393*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

বাবুর নিজের বাক্স ফিরে পাওয়ার তেমন তাগিদ না থাকলেও মানবিকতার খাতিরে অন্য জনের বাক্সটি ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। তাই তিনি ফেলুদাকে নিয়োগ করেন ওই বাক্সের প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করবার জন্য। কেসটি সমাধানের সূত্রে ফেলুদা আবার তোপ্সেকে সঙ্গে নিয়ে সিধুজ্যাঠার শরণাপন্ন হল। সিধুজ্যাঠার কাছেই ফেলুদা জানতে পারে যে, সেই ভ্রমণ কাহিনির লেখক শম্ভুচরণ বোস ছিলেন একজন গুণী লেখক। তাঁর লেখা তেরাইয়ের কাহিনি ছিল বিখ্যাত বই। বইটির নাম ছিল 'Terrors of Tera'। ১৯১৫ সালে লন্ডনের কীগ্যান পল কোম্পানি সেই বই ছেপে প্রকাশ করেছিল। দুর্দান্ত শিকারি আর বিখ্যাত পর্যটক ছিলেন শম্ভুচরণ। তবে তাঁর পেশা ছিলো ডাক্তারি। শম্ভুচরণ কাঠমান্ডুতে প্র্যাকটিস করতেন। ওখানে তখন রাণা-রা ছিলেন সর্বেসর্বা। রাণা-পরিবারের অনেকের রোগ সারিয়ে দিয়েছিলেন শম্ভুচরণ। ওই পরিবারের বিজয়েন্দ্র শমসের জঙ্গ বাহাদুর ছিলেন মদ্যপ শিকারি। তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন শম্ভুচরণ। রাণা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে একটি মহামূল্য রত্ন উপহার দিয়েছিলেন।

শম্ভুচরণ তিব্বতেও গিয়েছিলেন। তিব্বত ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর অপ্রকাশিত লেখাটি ছিল মহামূল্যবান। শম্ভুচরণের ইংরেজি ছিল যেমন স্বচ্ছ, তেমনি রংদার। একেবারে স্ফটিকের মতো। সিধুজ্যাঠা সেই অপ্রকাশিত ম্যানুস্ক্রিপ্টের জন্য সেই আমলে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি ছিলেন। সিধুজ্যাঠার কথা থেকে ফেলুদা বুঝতে পারে যে, দীননাথ বাবুর বাক্সে থাকা ওই পাণ্ডুলিপিটি কতোটা মূল্যবান ছিল। সুতরাং কেউ এই পাণ্ডুলিপির জন্য বাক্সটা বদলে দিতে পারে। উপন্যাসের শেষে জানা যায়, বাক্সটা ভুল করে বদলে যায়নি। ট্রেনে দীননাথবাবুর আর এক সহযাত্রী মি. পাকরাশী পরিকল্পনা করে ওটা সরিয়েছিলেন। নরেশচন্দ্র পাকরাশী নিজে শম্ভুচরণের লেখাটা প্রকাশ করতে চাইছিলেন। লেখাটার প্রতিই তাঁর নজর ছিল। তাঁর যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে পারে সেকথা মি. পাকরাশীর মনেই হয়নি। কিন্তু ফেলুদা বলেছিল,-

> "এই বাক্সরহস্যের ব্যাপারে আমি দীননাথবাবুর কাছে কেবল একটি পারিশ্রমিকই চাইব-সেটা হল এই খাতাটা।"[৯]

হতে পারে সিধুজ্যাঠার কথা মনে করেই ফেলুদা হয়তো খাতাটা চেয়ে নেবে বলে ভেবেছিল। কারণ এই কাহিনির শুরুতেই ফেলুদার কাছে সিধুজ্যাঠা শম্ভুচরণের ম্যানুস্ক্রিপ্টের প্রতি উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। গুরুদক্ষিণা দেওয়ার এমন সুযোগ সম্ভবত ফেলুদা ছাড়তে চায়নি। আর সিধুজ্যাঠা ওই পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ না করলে এবং তার মূল্য সম্পর্কে ধারণা না দিলে ফেলুদা এই কেস সমাধানের পথ এতো সহজে খুঁজে পেতো না।

'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' উপন্যাসে সিধুজ্যাঠা অনেক বেশি সক্রিয় চরিত্র। উপন্যাসের শুরুতে ফেলুদা কথা বলছিল পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত স্থাপত্য নিয়ে। তখনই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে সিধুজ্যাঠা এসে তাদের কলিং বেলটায় পরপর তিনবার সজোরে চাপ দিলেন। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললো তোপসে। বৃষ্টির ছাঁটের সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে ঘরে ঢুকলেন সিধুজ্যাঠা। তাঁর হাতের ছাতাটা ঝপাত করে বন্ধ করতেই আরো খানিকটা জল চারপাশে ছিটিয়ে পড়ল। দুর্যোগের মধ্যে এসেই 'ভালো চা'-এর ফরমাশ করলেন তিনি। সেদিন খুব চিন্তিত ছিলেন সিধুজ্যাঠা, খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন আমাদের দেশের 'শিল্পকলার খুন' নিয়ে। সিধুজ্যাঠা জানেন না এমন বিষয় নেই। তার মধ্যে আর্টের বিষয়ে তাঁর জ্ঞান সবচেয়ে বেশি। তাঁর তিন আলমারি বইয়ের মধ্যে দেড় আলমারিই হল আর্টের বই। হঠাৎ করে সিধুজ্যাঠা 'কালাপাহাড়'-এর প্রসঙ্গ টানলেন, যে কালাপাহাড় মধ্যযুগে প্রচুর হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। সিধুজ্যাঠা বললেন, -

> "কিন্তু আজ এই উনিশশো তিয়াত্তরে আবার যে কালাপাহাড়ের আবির্ভাব হয়েছে সেটা জানো কি?"[১০]

নতুন কালাপাহাড় হল মন্দিরের গা থেকে মূর্তি খুলে নেওয়া পাচারকারীরা। সিধুজ্যাঠার মতে, এই ব্যবসা আসলে বড়োসড়ো ক্রাইম।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 383 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সিধুজ্যাঠার কাছে কিছু পুরনো রাজপুত পেইন্টিং ছিল, যেগুলি তিনি থার্টি ফোরে কিনেছিলেন কাশীতে। সেগুলি তিনি গ্র্যান্ড হোটেলের ভিতরে নগরমলের দোকানে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন এক মার্কিন ব্যক্তি কাগজের মোড়কে মোড়া একটি মূর্তি নিয়ে সেখানে এসেছিল। সেই মূর্তি দেখে সিধুজ্যাঠা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। তাঁর ভাষায়,-

> "মোড়কটি যখন খুললে না-বলব কি ফেলু-আমার হৃদপিণ্ডটা একটা লাফ মেরে গলার কাছেচলে এল। একটা মূর্তির মাথা। লাল পাথরে তৈরি। আমার চেনা মুখ, শুধু তফাত এই যে সে মুখকে ধড়ের সঙ্গে লাগা অবস্থায় দেখেছি, আর এখন দেখছি সেটাকে ছেনি দিয়ে ধড় থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে।"[১১]

সিধুজ্যাঠা বাড়ি গিয়েই জিমার-এর বই খুলে দেখেছেন। যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই। ওই মুন্ডু খাস ভুবনেশ্বরের রাজারানি মন্দিরেরর গা থেকে ভেঙে আনা হয়েছে, সরকারি পাহারা সত্ত্বেও। সিধুজ্যাঠা ভুবনেশ্বরের আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে এক্সপ্রেস চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কিছু হবার ছিল না। সিধুজ্যাঠা ফেলুদার কাছে এসেছেন এই বিষয়টি নিয়ে বলার জন্য। কারণ তিনি এমন একজন মানুষ যিনি আর্টের ভ্যালু বোঝেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন এর একটা ইনভেস্টিগেশন হোক। ফেলুদা যেন কিছু করে। নাহলে দেশের ভাস্কর্য শিল্প, প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করা যাবে না। ফেলুদা সিধুজ্যাঠার দেখা সেই মূর্তি-বিক্রেতা মার্কিন ব্যক্তির পরিচয় খুঁজে বার করল, তার নাম সল সিলভারস্টাইন। কিন্তু কোনো ভাবেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ফেলুদার মতে, অত্যন্ত বেপরোয়া ও শক্তিশালী কিছু লোক আছে এই অপরাধের পিছনে। ফেলুদাকে এই সূত্রে সিধুজ্যাঠা বলেন,

> "ফেলু যদি এই ব্যাপারে কিছু করতে পারো তো দেশ তোমাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখবে এটা জোর দিয়ে বলতে পারি।"[১২]

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মস্তকহীন যক্ষীর খবর পরের দিনের খবরের কাগজেই বেরোলো। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ানক খবর হল, কোলকাতা থেকে কাঠমান্ডুগামী একটি বিমান উত্তর চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদের কাছে একটি গ্রামে ক্র্যাশ করেছে। সল সিলভারস্টাইনও অন্য যাত্রীদের সঙ্গে মৃত হয়েছেন।

সিধুজ্যাঠা ফেলুদাকে অনুরোধ করেন দুর্ঘটনার স্থান থেকে যক্ষীর মাথা উদ্ধার করার জন্য। এই কাজের জন্য সিধুজ্যাঠা ফেলুদাকে টাকাও দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফেলুদা এই প্রস্তাবটি নিজের উৎসাহেই গ্রহণ করেছিল। আর্ট সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যপ্রদানের জন্য সিধুজ্যাঠা নিজের সাহায্যের হাতটি বাড়িয়ে রেখেছিলেন। ঠিক হল, মূর্তির মাথাটা যদি পাওয়া যায়, তাহলে সেটা সোজা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের অফিসে গিয়ে দিয়ে আসা হবে। দুর্ঘটনার স্থানে ফেলুদারা পৌঁছোনোর আগেই অন্য এক ব্যক্তি যক্ষীর মাথাটা হাতিয়ে আনে। সেই লোকটির গতিবিধি অনুসরণ করে ফেলুদারা এলোরা যাওয়া স্থির করে। আওরঙ্গাবাদ ছিলো এলোরা যাওয়ার ঘাঁটি। এলোরায় রয়েছে পাহাড়ের গা কেটে বার করা কৈলাস মন্দির, পাহাড়ের গায়ে সারিবদ্ধভাবে দেড় মাইল জুড়ে গুহা। প্রায় প্রত্যেক গুহাতেই অসাধারণ ভাস্কর্য রয়েছে। সেখানকার গুহা থেকেও মূর্তি কেটে পাচার হচ্ছে বলে ফেলুদা সন্দেহ করে। সেই ব্যাপারে তদন্ত করতেই ফেলুদা যায় আওরঙ্গাবাদে। গর্বিত সিধুজ্যাঠা আলমারি থেকে একটি বই বার করে ফেলুদার হাতে দিয়ে বলেছিলেন,-

> "এটা তোমায় হেল্প করবে। ভালো করে একবারটি পড়ে নিয়ো। বইটির নাম ছিল- 'এ গাইড টু দ্য কেভস অফ এলোরা'।"[১৩]

এই তদন্তের শেষে ফেলুদা যে মূর্তিচোরদের শায়েস্তা করবে এবং বীরদর্পে ফিরেও আসবে, তার নেপথ্যে সিধুজ্যাঠার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। শুধু নেপথ্য-ভূমিকাই নয়, এই কাহিনিতে সিধুজ্যাঠা অত্যন্ত সক্রিয় চরিত্র হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। তাঁর উৎসাহেই ফেলুদা এই কেসটি সম্পর্কে উৎসাহিত হয়। একদিক থেকে তাঁকেই এই কাহিনিতে ফেলুদার মক্কেল বলা যায়। অন্যদিকে নিজে থেকে মূর্তিচুরির তদন্তের ব্যাপারে সিধুজ্যাঠার এই সক্রিয়তা থেকে তাঁর

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 49*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 383 - 393*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যও ফুটে ওঠে। তিনি শুধু যে আর্টের সমঝদার তা-ই নয়, দেশের শিল্পকর্মের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য তিনি অত্যন্ত সচেতন। সেদিক থেকে তাঁর দেশপ্রেম অকৃত্রিম।

'হত্যাপুরী' উপন্যাসটির মুখ্য উপজীব্য ছিল একটি প্রাচীন পুথি। এখানে সিধুজ্যাঠার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। কিন্তু সেই পুথির প্রসঙ্গে সিধুজ্যাঠার উল্লেখ দেখা যায়। সিধুজ্যাঠার কাছে ফেলুদা এবং তোপ্সের সত্যিকারের পুথি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনশো বছরের পুরনো মোট তিনটি পুথি আছে সিধুজ্যাঠার কাছে। ছাপাখানার আগের যুগে বই লেখা হত হাতে। ভূর্জপত্র, তালপাতার যুগ পার হয়ে যে কাগজে লেখা শুরু হয় তা সিধুজ্যাঠার কাছে তোপসেরা জানতে পেরেছে। সিধুজ্যাঠার মতে, পুথি জিনিসটা আমাদের আর্টের একটা অঙ্গ। সেটা অনেকেই মনে রাখেনি। কিন্তু ফেলুদা সেকথা ভোলেনি, আর তাই এই উপন্যাসে প্রাচীন একটি দুর্মূল্য পুথি উদ্ধারও করেছিল। এই উপন্যাসে সিধুজ্যাঠার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকলেও ফেলুদার কেস সমাধানে পরোক্ষভাবে তিনি কিছুটা ভূমিকা পালন করেছেন।

ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এই মানুষটি তাঁর বুদ্ধি-বৃত্তিকে নিয়োজিত করেছে জ্ঞান-চর্চায়। 'গোরস্থানে সাবধান!'-এ সিধু জ্যাঠার সেই জ্ঞানচর্চার নিত্যক্রিয়াটি স্পষ্ট-

> "...ভোরে উঠে হাঁটতে বেরোন সিধু জ্যাঠা লেকের ধারে। ...বাড়ি ফিরে সেই যে তক্তপোশের উপর বসেন, এক স্নান-খাওয়া ছাড়া ওঠা নেই। সামনে একটা ডেস্ক, তার উপর বই, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ। লেখেন না। চিঠিও না, ধোপার হিসেবও না, কিচ্ছু না। খালি পড়েন। ...বিয়ে করেননি।"[১৪]

বউ-এর বদলে বই নিয়ে ঘর করেন। বলেন, আমার সংসার, আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার। আমার ডাক্তার মাস্টার সিস্টার মাদার ফাদার সবই আমার বই।' তাঁর বসার 'তক্তপোশটারও অর্ধেকটা বইয়ে বোঝাই।' সিধু জ্যাঠার 'খুব বই কেনার বাতিক, আর বইয়ের খুব যত্ন'। 'বহুরূপী' (সন্দেশ, আষাঢ় ১৩৯০) গল্পে নিকুঞ্জকে তার জ্যাঠামশাই যে কথাগুলি বলেন, সেগুলি বোধকরি সিধুজ্যাঠারও মনের কথা- 'বই পড়ো। বই পড়ে না শেখা যায় এমন জিনিস নেই। ইস্কুলের দরকার হবে না, মাস্টারের দরকার হবে না-স্রেফ বই।' সিধু জ্যাঠা কী পড়েন? পড়েন 'ক্রিমিন্যাল ইনভেসটিগেশনের ইতিহাস', প্যারাসাইকলজিক্যাল সোসাইটির জার্নাল, শম্ভুচরণ বোসের লেখা ভ্রমণ-কাহিনি, এমনি বিবিধ বিষয়ের হরেক বই।

পুরোনো কোলকাতা সম্পর্কে ফেলুদার উৎসাহের জন্য সিধুজ্যাঠাই অনেকটা দায়ী। ফলে, ফেলুদা নিশ্চিত ভাবে জানতো যে, টমাস গডউইনের খবর আর কেউ দিতে পারুক না পারুক, সিধুজ্যাঠা নিশ্চয়ই পারবেন। সেই জন্যই ফেলুদা এই তথ্য জানার জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে না গিয়ে সিধুজ্যাঠার কাছে যায়। পুরোনো কোলকাতা নিয়ে উৎসাহের বশেই হোক, বা ঝড়ে ক'টা গাছ পড়ে গেছে তা দেখার জন্যই হোক-ফেলুদা, তোপসে এবং লালমোহনবাবু পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানে গিয়েছিল। সেখানেই তারা টমাস গডউইনের সমাধি সম্পর্কে জানতে পারে। এরপর তাদের পরবর্তী গন্তব্য হয় সিধুজ্যাঠার বাড়ি। টমাস গডউইনের নাম শুনে সিধুজ্যাঠার কপালে ছ'টা ভাঁজ পড়ে। তারপর তিনি অনেক পুরোনো পেপার কাটিং বার করলেন। ১৭৮৮ সালে জন্ম আর ১৮৫৮ সালে মৃত্যু যে গডউইনের তার সম্পর্কে 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে একটা লেখা বেরিয়েছিল, লিখেছিলেন টমাসেরই মেয়ে শার্লট গডউইন।

ওই লেখা থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষে এসে টমাস গডউইনের কীর্তিকলাপ রীতিমতো গল্পের মতো। ইংরেজরা তখন ভারতবর্ষে আসতে শুরু করেছে। ভারতবর্ষের অলিতে-গলিতে তখন সাহেবদের দেখা যায়। তখনই ইংল্যান্ড থেকে লখনৌতে এসে হাজির হয়েছিলেন টমাস গডউইন। সিধুজ্যাঠার কাছ থেকেই ফেলুদা জানতে পেরেছিল টমাসের জীবন কাহিনি; তাঁর জুয়ার নেশা, রেস্টোরেন্ট খোলা, জীবনের উত্থান-পতনের নানা কাহিনি। এশিয়াটিক সোসাইটিতে নাকি তাঁর বিষয়ে লেখা আছে। তবে সিধুজ্যাঠা প্রায় সম্পূর্ণটাই নিজের মতো করে বাংলায় গুছিয়ে বলেছিলেন। সিধুজ্যাঠার সঙ্গে আলোচনার সূত্রেই কেসটার মধ্যে প্রবেশ করেছিল ফেলুদা- যাকে বলা যায় 'গ্রেভ ডিগিং' কেস। তবে সিধুজ্যাঠা প্রথমে এই কেসটিকে বুনো হাঁসের পিছনে ধাওয়া করার মতো বলেছিলেন। তবে যখন শুনলেন যে গডউইনের পরবর্তী তিন পুরুষের কেউ না কেউ এদেশেই মারা গেছেন, তখন তিনি খুব খুশি হয়ে ফেলুদাকে বলেছিলেন, -

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 49*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 383 - 393*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

"সাবাস। ধন্যি তোমার অনুসন্ধিৎসা আর অধ্যবসায়"[১৫]

ফেলুদাকে 'গুড লাক' জানিয়েছিলেন সিধুজ্যাঠা। 'গ্রেভ ডিগিং' নিয়ে তাঁর তেমন উৎসাহ না থাকলেও টমাস গডউইনের মতো কালারফুল চরিত্র সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে, এটা ভেবে তিনি বেশ খুশি হয়েছিলেন। কারণ টমাসের শেষ জীবন সম্পর্কে তাঁর মেয়ের লেখা প্রতিবেদনে কিছু ছিলনা। সিধুজ্যাঠার দেওয়া তথ্যের জোরেই ফেলুদা গোরস্থানের রহস্য সমাধান করেছিল। খুঁজে পেয়েছিল টমাস গডউইনকে তাঁর রান্নার জন্য দেওয়া লখনৌ-এর নবাব সাদাত আলির প্রথম বখশিস-ইংল্যান্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারিগর ফ্রান্সিস পেরিগ্যাল-এর তৈরি 'রিপিটার' পকেট ঘড়ি। দুশো বছর ধরে তার মালিকের কঙ্কালের পাশে ভূগর্ভে থেকেও এই ঘড়ির জৌলুস চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো ফেলুদা-তোপসে-জটায়ুর।

'গোলকধাম রহস্য' গল্পেও অন্যতম তথ্য-সরবরাহকারী ছিলেন সিধুজ্যাঠা। এই তদন্তের মূল চরিত্র নীহার দত্ত। তিনি একটা সময় ভাইরাস নিয়ে রিসার্চ করছিলেন। মিশিগ্যান ইউনিভার্সিটিতে ভাইরাস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে একটা বিস্ফোরণ হয়। তাতে প্রাণে বেঁচে গেলেও নীহারবাবুর চোখ দুটো বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তিনি অন্ধ হয়ে যান। সিধুজ্যাঠা নামটি একবার শুনেই নীহার দত্তকে চিনতে পারেন। এই জন্যই ফেলুদা বলে সিধুজ্যাঠার 'ফটোগ্রাফিক মেমরি'। সিধুজ্যাঠার কাছ থেকে ফেলুদা যে নতুন তথ্যটি পায় তা হল, ল্যাবরেটরিতে অ্যাক্সিডেন্টের সময় নীং দত্তর সঙ্গে আরো একজন ছিল। সে নীহারবাবুর সহকারী সুপ্রকাশ চৌধুরী। অ্যাক্সিডেন্টে তার কোনো ক্ষতি হয়নি। পরে তার আর কোনো খবরও পাওয়া যায়নি। সিধুজাঠার কাছ থেকে জানা যায় যে, নীহার দত্ত এরপর আর বিজ্ঞানের জগতে তেমন কিছু করতে পারেননি। দুটো চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে তা সম্ভবও ছিল না। এরপর সিধুজ্যাঠা নিজেই ফেলুদার বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন সুপ্রকাশ চৌধুরীর খবর নিয়ে। খাতার ওজন খুব বেশি বলে তিনি খবরটা কপি করে এনেছিলেন। ১৯৭১ সালে মেক্সিকোতে একটা ড্রাগ কোম্পানির উপরে পুলিশি হামলা হয়। তাতে একজন বায়োকেমিস্ট ধরা পড়ে, তার নাম এস. চৌধুরী। তবে এই 'এস'ই 'সুপ্রকাশ' কিনা তা সিধুজ্যাঠা জানেন না, কারণ খবরের কাগজে যা লেখা নেই সে ব্যাপারে তাঁর কিছু করার নেই। চলে যাওয়ার সময় সিধুজ্যাঠা তোপ্সের কানে একটা মোচড় দিয়ে চলে যান। কাহিনির শেষে এই নীহার দত্ত আর সুপ্রকাশ চৌধুরী চরিত্র দু'টিই মূল কুশীলব হয়ে যান। নাম পাল্টে নীহার দত্তর ভাড়াটে হয়ে বাস করছিল সুপ্রকাশ। অন্ধ নীহার দত্ত তাকে চিনতে পেরে খুন করেন। সুপ্রকাশই মিশিগ্যানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নীহারের চোখ এবং বৈজ্ঞানিক জীবন নষ্ট করে দিয়েছিল। সেই বিশ্বাসঘাতককে খুন করার জিঘাংসাই এতো বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছিল নীহারবাবুকে। সুপ্রকাশকে খুন করার পর মাত্র সতেরো দিন বেঁচে ছিলেন নীহার দত্ত।

'গোলাপী মুক্তা রহস্য' গল্পটিতে আবার বহুদিন পরে ফেলুদা আর তোপ্সে গিয়েছে সিধুজ্যাঠার বাড়িতে। প্রথমে সিধুজ্যাঠার একটু অভিমান হয়েছিল। তারপর ফেলুদার রসিকতায় আবার খুশি হয়ে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলেন তিনি। কথায় কথায় জানা যায় যে, ফেলুদার যখন আট বছর বয়স তখন থেকে তার সঙ্গে সিধুজ্যাঠার কথা শুরু হয়েছিল। আট বছরের ফেলু এয়ারগান দিয়ে পাখি মেরে সিধুজ্যাঠাকে এনে দেখিয়েছিল। কিন্তু সিধুজ্যাঠার কথা মেনে নিরীহ জীব হত্যা বন্ধ করেছিল। উপন্যাসে ফেলুদা, সিধুজ্যাঠার কাছ থেকে সুরজ সিং নামের এক মাল্টি মিলিয়নিয়র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। হিরে-জহরতের অমন সংগ্রহ নাকি আর কারোর নেই। সুরজ সিং সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে সিধুজ্যাঠা বেশ মজা করে একটা দামী কথা বলেছিলেন, -

> "এসব লোককে ভালো-খারাপ বলে বর্ণনা করা যায় না। তুমি হয়তো গিয়ে দেখলে তার মতো অতিথি বৎসল লোক আর হয় না-তোমাকে রাজার হালে রেখে দিল। আবার পরদিনই হয়তো সেই লোকই তার কালেকশনের জন্য পাথর আদায় করতে একজনকে খুনই করে ফেলল। অবশ্য নিজের হাতে নয়; এরা সবসময় আইন বাঁচিয়ে চলে, যদিও তার জন ট্যাক খরচা হয় অনেক।"[১৬]

এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, সিধুজ্যাঠা বইয়ের বাইরেও বাস্তব জগৎ সম্পর্কে কতোটা স্বচ্ছ ধারণা রাখেন।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 383 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাহিনিতে অবশ্য ফেলুদা সুরজ সিং-এর কাছে গিয়ে বোকা বনে যায়। সুরজ সিং তাজ্জব হয়ে যায় ফেলুদার আনা ঝুটা গোলাপি মুক্তো দেখে। পারস্পরিক সমঝোতায় সে ফেলুদাকে বিদায় জানায়। ফেলুদাকে বাঁচাতে তোপ্সে ও লালমোহন বাবুর মিলিত কারচুপি ধরা পড়ে কাহিনির শেষে। তারা দু'জন আসল মুক্তোটা লুকিয়ে রেখেছিল, যাতে ফেলুদাকে এজন্য বিপদে পড়তে না হয়। গোলাপি মুক্তোর ঝলমলে আলোয় এই রহস্যের মধুরেণ সমাপয়েত ঘটে।

পূর্বোক্ত ছ'টি গল্প-উপন্যাস ছাড়া 'টিনটোরেটোর যীশু' তেও সিধুজ্যাঠার উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে সেখানে তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। এই কাহিনিটি আবর্তিত হয়েছে রেঁনেসাসের সময়ে আঁকা একটি ইতালিয় ছবিকে কেন্দ্র করে। তোপ্সে একবার জানিয়েছে, ফেলুদা আর্ট-সম্পর্কিত দু'টি বই নিয়ে এসেছে সিধুজ্যাঠার কাছ থেকে। কাহিনিতে সিধুজ্যাঠার ভূমিকা এটুকুই।

আমরা জানি যে বাংলা লোককথায় একজাতীয় চরিত্রের আবির্ভাব ঘটত যাঁদেরকে বলা চলে 'সর্বজ্ঞ'। প্রায়শই গল্পের নায়ককে তাঁরা বাতলে দিতেন তাদের সমস্যা-সমাধানের পথ। বাংলা লোককথার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী যেমন। উপেন্দ্রকিশোরের লেখা 'ঘ্যাঁঘাসুর' (মুকুল, কার্তিক ১৩০৫) গল্পের ঘ্যাঁঘাসুর এমনই এক 'জ্ঞানী', যাঁর কাছে মানিকের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মেলে। সত্যজিতের রূপকথার গল্প 'কানাইয়ের কথা'-তেও আমরা দেখব 'ত্রিকালজ্ঞ' জগাইবাবাকে, যিনি সবজান্তা। 'সর্বজ্ঞ' এই বিশেষ আর্কেটাইপেরই একটি আর্কেটাইপ ইমেজ 'সিধুজ্যাঠা'। অবশ্য অন্য একটি বিদেশি উৎস সত্যজিৎ নিজেই নির্দেশ করে গেছেন। 'সোনার কেল্লা' সিনেমায় যে-অংশ ভাট করেও সত্যজিৎ মূল ফিলমে রাখেননি, সেখানেই তোপসেকে সিধু জ্যাঠা বলে- 'দেখেছ তপেশবাবু - তোমার গুরু ত-তারও আবার গুরু আছে।' কে এই মহা-গুরু? ১৭ জুলাই ১৯৭৬-এ 'অমৃত' পত্রিকার বৈকুণ্ঠ পাঠককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেন—

> "শার্লক হোমসের দাদার নাম ছিল মাইক্রফট হোমস। বুদ্ধির টান পড়লে শার্লক তার কাছে গিয়ে পরামর্শ নিত। আমিও তেমনি সিধু জ্যাঠা চরিত্র রেখেছি।"[১৭]

উৎসের এই স্বীকৃতি স্বয়ং সিধু জ্যাঠার মুখ দিয়েও সত্যজিৎ দিয়েছেন 'গোলাপী মুক্তা রহস্য'-তে। সেখানে সিধু জ্যাঠা ফেলুদাকে বলেন-

> "... শার্লক হোমসের এক দাদা ছিল জানতে? মাইক্রফট হোমস। জাত কুঁড়ে, কিন্তু বুদ্ধিতে সত্যিই শার্লকের দাদা। সেই দাদার কাছে শার্লক মাঝে মাঝে যেত পরামর্শ নিতে। আমি হচ্ছি সেই মাইক্রফট।"[১৮]

'দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রিটার' গল্পে শার্লক নিজেই তার দাদার বর্ণনা দেয় -

> "I said that he was my superior in observation and deduction. If the art of the detective began and ended in resoning from an armchair, my brother would be the greatest criminal agent that ever lived. But he has no ambition and no energy ...He has an extraordinary facultly for figures, and audits the books in some of the government departments...he walked round the corner into whitehall every morning and back every evening. From year's end to year's end he takes no other exercise, and is seen no-where else..."[১৯]

'দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যান' গল্পে হোমস তার দাদার সম্পর্কে ওয়াটসনকে বলে-

> "He has the tidiest and most orderly brain, with the greatest capacity for storing facts, of any man living..."[২০]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 383 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সরাসরি মাইক্রফটের থেকে আরও অন্তত দু'টো বৈশিষ্ট্য ধার করেছেন সিধু জ্যাঠা। 'দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যান' গল্পে আমরা দেখি মাইক্রফট আসছে শার্লকের আস্তানায়। তাই দেখে শার্লক-ওয়াটসনের কথোপকথন-

> "Well, Well! What next?' said he. 'Brother Mycroft is Coming round.' 'Why not?' I asked. 'Why not? It is as if you met a tram-car coming down a country Lane."[২১]

আলোচিত সাতটি গল্প-উপন্যাস থেকে দেখা যায়, ফেলুদা-সিরিজের প্রথম দিকে সিধুজ্যাঠার উপস্থিতি বা ভূমিকা যতোটা ছিল, পরের দিকে তা ক্রমশ কমতে থাকে। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে, গোয়েন্দা হিসেবে পোক্ত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা নিজেই যথেষ্ট জ্ঞানী হয়ে উঠেছে। সে নিত্য-নতুন বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করে। ফলে তার সিধুজ্যাঠার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন অনেকটা কমে যায়। তাছাড়া ব্যস্ততাও এর একটা কারণ। তবে ফেলুদার এই পড়াশুনা বা জ্ঞানচর্চার অভ্যাসের অনেকটাই যে সিধুজ্যাঠার কাছ থেকে পাওয়া, তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। অর্থাৎ, ফেলুদার তৈরি হয়ে ওঠার পিছনে সিধুজ্যাঠার ভূমিকা কোনো ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে 'সন্দেশ'-এর পাতায় ফেলুদার প্রথম আবির্ভাব। প্রথম গল্প ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি। ফেলুদার ভালো নাম হল প্রদোষ চন্দ্র মিত্র। নিজের ভিজিটিং কার্ডে ফেলুদা নামটি ইংরেজিতে এভাবে ছাপিয়েছিল-

> "Prodosh C Mitter, Private Investigator,"[২২]

জটায়ুর ভাষায়, এর অর্থ-'প্র' হল 'প্রফেশনাল', 'দোষ' হল 'ক্রাইম', আর 'সি' হল 'টু-সি' অর্থাৎ দেখা অর্থাৎ 'ইনভেস্টিগেশন'। ফেলুদার বাবার নাম ছিল জয়কৃষ্ণ মিত্র। তিনি ছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের অঙ্ক আর সংস্কৃতের শিক্ষক। জয়কৃষ্ণর ছিল মুগুরভাজা শরীর। ফুটবল, সাঁতার, কুস্তি-সব কিছুতেই তিনি ছিলেন পারদর্শী। শেয়ালের গর্তে হাত ঢুকিয়ে তিনি শেয়ালের বাচ্চা চুরি করতেন। সব ব্যাপারেই তিনি দুঃসাহসী ছিলেন।[২৩]

ফেলুদার যখন ন'বছর বয়স, তখন জয়কৃষ্ণর অকালমৃত্যু ঘটে। সিধুজ্যাঠা ছিলেন জয়কৃষ্ণর গ্রামতুতো দাদা। ফেলুদার প্রতি গভীর স্নেহের দৃষ্টি ছিল তাঁর। বাবার মতোই মান্য করতো ফেলুদা সিধুজ্যাঠাকে। সবাই যেখানে প্রদোষ মিত্তিরকে 'ফেলু' অথবা 'ফেলুদা' বলে ডাকতো, সিধুজ্যাঠা তাকে ডাকতেন 'ফেলুচাঁদ' বলে। আদরের ডাক, সন্দেহ নেই। ফেলুদা এই স্নেহ-আদরের যোগ্যও ছিল। ফেলুদা দরকার পড়লেই নিঃসংকোচে ছুটে যেতো সিধুজ্যাঠার বাড়ি। সিধুজ্যাঠা নিজেও অনেকবার এসেছেন ফেলুদার বাড়িতে। অন্য কাউকে তিনি নিজের প্রাণপ্রিয় বই দিতে চাইতেন না, শুধু ফেলুদাকে দিতেন। এতোটাই আস্থা ছিল তাঁর ফেলুদার উপরে। ফেলুদাও এই আস্থার মর্যাদা রাখতো।

কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা নিজেদের প্রতিভার প্রয়োগ করেন না। সিধুজ্যাঠা তেমনই এক প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি অনেক তথ্য, সংবাদ আত্মস্থ করে বিপুল জ্ঞানের আধার হয়ে উঠেছিলেন। ইচ্ছে করলে তিনিও গোয়েন্দা হতে পারতেন। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট কাজের গন্ডিতে বাঁধা পড়াটা তাঁর স্বভাব নয়। সিধুজ্যাঠার মতে,-

> "সময়কে যদি আমি ইচ্ছেমতো ব্যয় না করতে পারি তাহলে লাভটা কী?"[২৪]

সিধুজ্যাঠা তাই সময়কে কাজে লাগিয়েছেন নিজের ইচ্ছে মতো। কারো অধীনে বাঁধা পড়েননি কখনো। একথা ঠিক, তথাকথিতভাবে সিধুজ্যাঠা খুব সামাজিক চরিত্র নন। তিনি একা থাকেন, বিশেষ কারো সঙ্গে মেলামেশা করেন না। তাঁর সমস্ত ভালোবাসা শুধু বই আর খবরের কাগজের প্রতি। কিন্তু তিনি যে সামাজিক ব্যাপারে সচেতন তা তাঁর এই খবরের কাগজ প্রীতি থেকেই বোঝা যায়। কৈলাসে কেলেঙ্কারি উপন্যাসে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ফেলুদাকে দেশের প্রাচীন মূর্তি রক্ষার ব্যাপারে তদন্তে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, তিনি সমাজ-স্বদেশ নিয়ে মোটেই উদাসীন নন। তিনি শুধু বইয়ের খোলসের মধ্যে গুটিয়ে থাকেন মাত্র। সিধুজ্যাঠাকে ফেলুদা বলেছে 'শ্রুতিধর', তোপ্সের মতে তিনি 'বিশ্বকোষ'। শুধু বই বা খবরের কাগজ পড়া নয়, তা আত্মস্থ করে আজীবন মনে রাখাই তাঁর আসল বৈশিষ্ট্য। লাইব্রেরিতে গেলে হয়তো বই বা খবরের কাগজ পাওয়া যায়, কিন্তু কোন বইয়ের কোন পাতায়, বা কবেকার খবরের কাগজে নির্দিষ্ট

তথ্য বা সংবাদটি পাওয়া যাবে, তা বলার কেউ থাকে না। তাই তা খড়ের গাদায় সূঁচ খুঁজতে যাওয়ার মতোই দুরূহ প্রক্রিয়া। বিশেষ করে তাড়াহুড়োর সময়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে খুব একটা কাজ হয় না।

এদিক থেকেই সিধুজ্যাঠার অনন্যতা। তিনি কোনো নাম বা বিষয় একবার শুনলেই নির্দিষ্ট বইয়ের পাতাটি বা খবরটি বের করে দিতে পারেন। এই জন্যই দরকারের সময় ফেলুদা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে না গিয়ে সিধুজ্যাঠার কাছে যায়। তিনি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত তথ্যটি দিয়ে ফেলুদাকে নিশ্চিন্ত করেন। সেই তথ্যটি ফেলুদাকে কেস সাজাতে, ঠিক পথে ভাবতে সাহায্য করে। এই ভাবে সিধুজ্যাঠা আলোচিত পাঁচটি গল্প-উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে ফেলুদার গোয়েন্দাগিরিতে ভূমিকা পালন করেছেন।

সিধুজ্যাঠা ফেলুদার গুরুস্থানীয়। ফেলুদা তাঁকে মান্য করে। তাঁদের দু'জনের সম্পর্ক অনেকটা পিতা-পুত্রের মতো। ফেলুদা-কাহিনির সব লেখায় সিধুজ্যাঠার উপস্থিতি নেই। আমরা আগেই দেখেছি, ফেলুদার পঁয়ত্রিশটি গল্প-উপন্যাসের মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে সিধুজ্যাঠা প্রত্যক্ষ ভাবে রয়েছেন, আর অন্য দু'টিতে তাঁর নামোল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু উপস্থিতির স্বল্পতা দিয়ে তাঁর গুরুত্ব বিচার করা যাবে না। সিধুজ্যাঠা অত্যন্ত বর্ণময় চরিত্র। যে কটি কাহিনিতে তিনি আছেন, সেগুলিতে তদন্তের প্রয়োজনীয় সিংহভাগ তথ্য সরবরাহ করেছেন সিধুজ্যাঠা। আশ্চর্যভাবে দেখা যায়, সেই তথ্যগুলিই কাহিনির শেষে রহস্য সমাধানের মূল সূত্র হিসেবে কাজ করেছে।

ফেলুদা ও সিধুজ্যাঠার সম্পর্কটি একটি মানবিক সম্পর্ক। স্নেহের বন্ধন ছিল তাঁদের মধ্যে। আরো গভীরভাবে ভাবলে বলা চলে সম্পর্কটি হল গুরু-শিষ্যের বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের সম্পর্ক। আবার সেই সঙ্গে দু'জনের সম্পর্কটি হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতারও। একান্ত ভরসাস্থল, তার বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক।

**Reference:**


১. রায়, সত্যজিৎ, যখন ছোটো ছিলাম, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রন, ১৪১৫, পৃ. ২৬

২. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ (সম্পা), আনন্দামেলা, তারিনীখুর ও ডুমনিগড়ের মানুশখেক,১৩ জানুয়ারি, ১৯৮২, ৭ম বর্ষ ২০ সংখ্যা, পৃ. ৬

৩. রায়, সত্যজিৎ, ফেলুদা সমগ্র ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ২৫০

৪. তদেব, পৃ. ১৯২

৫. রায়, সন্দীপ ও রায়, সোমনাথ (সম্পা.) সাক্ষাৎকার সমগ্র, পত্রভারতী, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ২৬০

৬. রায়, সত্যজিৎ, ফেলুদা সমগ্র ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ১২

৭. রায়, সত্যজিৎ, ফেলুদা সমগ্র ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ১৯২

৮. তদেব, পৃ. ২৫৪

৯. তদেব, পৃ. ২৯৪

১০.তদেব, পৃ. ৩১৮

১১. তদেব, পৃ. ৩১৮

১২. তদেব, পৃ. ৩২০

১৩. তদেব, পৃ. ৩৩১

১৪. তদেব, পৃ. ৫৯৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 383 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৫. তদেব, পৃ. ৫৯৮
১৬. রায়, সত্যজিৎ, ফেলুদা সমগ্র ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ৫৫০
১৭. ঘোষ, তুষারকান্তি (সম্পা.), অমৃত পত্রিকা, ১৬ এপ্রিল ১৯৭৭, ১৬ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, পৃ. ১৪
১৮. রায়, সত্যজিৎ, ফেলুদা সমগ্র ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ৫৪৯
১৯. Doyel, A. Connan (1884), "Adventure of Bruce Partingtone Plans", The memories of Sharlok Holmes,Standard Magazine,1892 october, p. 184
২০. Doyel, A. Connan (1908), "Adventure of The Greek Interpreter", His Last Bow: Some Reminisecnces of Sharlok Holmes, Standard Magazine,1908 Decenber, p. 689
২১. Doyel, A. Connan (1908), "Adventure of The Greek Interpreter", His Last Bow: Some Reminisecnces of Sharlok Holmes, Standard Magazine,1908 Decenber, p. 690
২২. রায়, সত্যজিৎ, ফেলুদা সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ৮২
২৩. তদেব, পৃ. ১৮২
২৪. তদেব